সাগরিকা



প্রাপ্তিস্থান

কমলা বুক ডিপো

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসদাশিব চক্রবর্ত্তী, এম, এ, কাব্যতীর্থ।
২৩।৩।২এ. রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল।

দাম—দুই টাকা

তাপসী প্রেস
৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।





উৎসর্গ

বিশ্ব-কবির আসন লভিলে
তুমি রবীন্দ্রনাথ
মরণ পারেও সুধীজন-হিয়া
করে তোমা' প্রণিপাত ;
ছায়া-বীথি ঘেরা 'শান্তি' নিলয়ে
'গুরুদেব' মোর তুমি
'সাগরিকা' সুরে রচিয়া অর্ঘ্য
প্রণমি,— আশীষকামী।

ভূমিকা

কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে আলংকারিকেরা সংক্ষেপে বলেছেন যে 'কাব্য হল রসাত্মক বাক্য।'

এর পরের কথা হচ্ছে 'রস' কাকে বলে এবং 'রসাত্মক বাক্যের' স্বরূপই বা কি ?

কাব্যলক্ষণের এই সব বিশিষ্ট ও বিশদ ব্যাখ্যা বিদগ্ধ রসিকজনের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এ কথা মানি, কিন্তু এও তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্রকৃত রসিকজনের সংখ্যা সকল দেশেই বিরল। কাব্যরসাস্বাদনে অধিকারী মানুষ 'কোটীকে গুটিক' মেলে! এই জন্যই যুগে যুগে ও দেশে দেশে কবিযশঃপ্রার্থীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া কোনও দিনই সহজ-সাধ্য হয়নি।

এই অনন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যেই আমরা যেমন বিশ্ব-স্রষ্টারও অনন্ত শক্তির পরিচয় পাই, তেমনি কবিরও সম্যক পরিচয় বহন করে তাঁর রচিত কাব্য ও কবিতা। কোনও রকম ভূয়িষ্ঠ ভূমিকা—তা' সে যত সুবৃহৎই হোকনা, কোনও বিশদ কবি-পরিচিতি, কাব্যের ভাবার্থ বিশ্লেষণ এবং অখণ্ড অনুকূল সমালোচনাই লেখককে কবির প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারে না, যদি তাঁর রচনা ভাব-সম্পদে, কল্পনার ঐশ্বর্যে, ছন্দের মাধুর্যে, শব্দের ঝংকারে, প্রকাশ-ভঙ্গীর লালিত্যে ও বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং সর্বোপরি দরদী মনের মর্মস্পর্শী ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তির গুণে তা অভিনব ও অপরূপ হয়ে না উঠতে পারে। ষড়ৈশ্বর্যশালিনী কাব্যলক্ষ্মীর রত্নসিংহাসনখানি যে কবির মানসলোকে দৈবায়ত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেবলমাত্র

তাঁরই অনুপম রচনা নিখিল নরনারীর মরমে প্রবেশ ক'রে তাদের প্রাণকে আকুল ক'রে তোলে।

'সাগরিকার' কবি প্রথিতযশা নন। তাঁর ললাটপটে কোনও প্রজ্ঞাত কবি-পরিচিতি নেই। বাণীর চরণপদ্মে একজন অজানা কবি হিসাবেই 'জানা' কবির এই প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন। তিনি ছিলেন বাগ্দেবীর মন্দিরে একজন নীরব পূজারী। শঙ্খ ঘণ্টার সঘন নিনাদে তিনি কোনও দিনই তাঁর অর্চনাকে সর্বসাধারণের গোচরে আনবার প্রয়াস পাননি। তাই তিনি ছিলেন এতদিন অজ্ঞাত। কোনও লেখক অজ্ঞাত ছিলেন বলেই যে তাঁর রচনা অবজ্ঞাত হবে এমন কোনও কথা নেই।

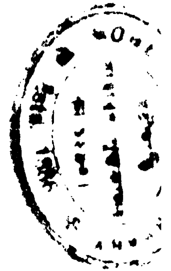
ইংরাজী ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরের সাধনার ফল সঞ্চিত ক'রে নিয়ে তিনি আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। এই পনেরো বৎসরের মধ্যে তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছিলেন, তারই কয়েকটি নির্বাচিত করে তিনি দেবী ভারতীর এই পূজার নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। সাজিয়েছেন বোধ করি রচনাগুলির গুণ-বিচার অনুসারেই; কারণ এগুলি যে কালানুক্রমিক সন্নিবেশিত হয়নি এটা সহজেই বোঝা যায় তাঁর প্রত্যেক রচনার পদাঙ্কে প্রদত্ত রচনা-কাল অনুদৃষ্টে।

এ ভাবে কবিতা সন্নিবেশের ফলে পাঠকের একটা মস্ত অসুবিধা হয় এই যে, সে কবিপ্রতিভার পরিণতি-পথে গতি নির্দেশে অক্ষম হয়। কালক্রমে ধীরে ধীরে কবির রচনা যে উৎকর্ষ লাভের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে সে ধারাটি অনুসরণ করে চলবার সূত্র সাধারণ পাঠকের পক্ষে জটিল হয়ে উঠেছে এখানে।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের পরিচয়-পৃষ্ঠায় যদিও কেবলমাত্র 'সাগরিকা'র নামটাই প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় কবির মানস কন্যা তিনটি—'সাগরিকা', 'হিমলেখা' ও 'ধূপশিখা'। 'সাগরিকা'র জন্ম পুরীর সমুদ্র-তীরে; 'হিমলেখা' ভূমিষ্ঠ হয়েছে হিমালয়ের ক্রোড়ে; আর 'ধূপশিখা'র আবির্ভাব কবির নিজ-নিকেতনে।

তিনটি বিশেষ বিভাগে বিভক্ত হলেও কবিতাগুলি যে পরস্পরের সোদরা—কেউবা অনুজা—কেউবা অগ্রজা—এ কথাটা কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন হয় না। কারণ শ্রেণী হিসাবে এরা তিন দলের সবাই অনেকটা এক জাতেরই। সেই জাতিটিকে 'লিরিক্স্' বা লিরিক্সেরই 'স্বগোত্র' বলে নির্ণয় করা চলে।

কবি শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর ছাত্র ছিলেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে লিরিক্সের যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী—আশৈশব তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্য লাভের গুণে গীতিকবিতারই বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে উঠা 'সাগরিকা'র কবির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অনুরাগ যতই আন্তরিক, নিবিড় ও গভীর হোক না কেন, শক্তির তারতম্য অনুসারে গুরু-শিষ্যের মধ্যে একটা বিপুল প্রভেদ অনিবার্য। গুরুর অপেক্ষা উচ্চতর প্রতিভার অধিকারী যে শিষ্য, তার কথা অবশ্য ভিন্ন। দ্রোণাচার্যের সকল শিষ্যই ত অর্জুন হয়ে উঠতে পারেনি।



'সাগরিকা'র কবি সম্বন্ধেও বলা চলে ইনি 'রবীন্দ্রপন্থী' হলেও রবীন্দ্র-প্রতিভার তুঙ্গ শৃঙ্গ রয়ে গেছে আজও আমাদেরই মতো এঁরও নাগালের বাইরে। কাজেই এঁর রচিত গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে সঙ্গীতের সুরলালিত্য এবং কাব্যলোকের ছন্দোবদ্ধ যথেষ্ট থাকা সত্বেও—যে বস্তু এনে

দেয় তার মধ্যে সেই 'পারফেক্‌শান্' যার গুণে গীতিকবিতা সকল দিক দিয়ে হ'য়ে ওঠে সার্থক, মাধুর্যে মণ্ডিত,—সে পরিপূর্ণ রসরূপ একজন নবীন কবির রচনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে এরূপ আশা করাটাই আমাদের পক্ষে ভুল হবে। তবে সচন্দন গন্ধপুষ্পের সঙ্গে তুলসী দুর্বাদলেরও বিগ্রহপদে পৌঁছবার একটা সমান ও সহজ অধিকারও যে আছে একথা অস্বীকার করা চলে না।

একই বৃন্ত সংযুক্ত বিল্বপত্রের তিনটি পল্লবের মতো এই 'সাগরিকা', 'হিমলেখা' ও 'ধূপশিখা'র কবিতাগুলি কাব্য সঙ্গীতের যে রসরূপটিকে মূর্ত করে তুলেছে তা আধুনিক কাব্যলোকে বর্তমানযুগের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে হয় ত' সমান তালে মানে চলতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ এর সুরলয়ের মধ্যে অতি আধুনিক কাব্য-প্রগতির রিরংসা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং এরূপ একখানি কাব্যগ্রন্থ আজকের দিনে প্রকাশ করার বিশেষ কোনও সার্থকতা সম্ভবত অনেকেই খুঁজে পাবেন না। কিন্তু, যদি তাঁরা তাঁদের রুচি ও দৃষ্টিকে কেবলমাত্র নিজেদের 'ভাল লাগা-মন্দ লাগার' স্বার্থসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ঈষৎ উদার দৃষ্টি নিয়ে কবির আপন কামনা বাসনা ও সঙ্কল্প সিদ্ধির আনন্দজনিত সার্থকতার দিকে ফিরে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে খুব উচ্চ অঙ্গের আদর্শ কাব্যগ্রন্থ না হলেও এ ধরণের রচনারও একটা নিজস্ব প্রয়োজন ও মূল্য আছে।

যা শ্রেষ্ঠ নয় তাকেই অপাংক্তেয় বলে বর্জন করার একটা রীতি অধুনা সমালোচক মহলে প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু এ অভিমত অনুমোদন করলে অন্যায় ও অবিচারকেই প্রশ্রয়

দেওয়া হবে। কারণ এমন অনেক রচনা আছে যা শ্রেষ্ঠ না হলেও উৎকৃষ্ট রচনার পর্যায় পড়ে।

'সাগরিকা'র কবি নিজেই বলেছেন ভাষার তুলিকা লয়ে এ ছেলেখেলা একদিন সকলেই ভুলে যাবে—

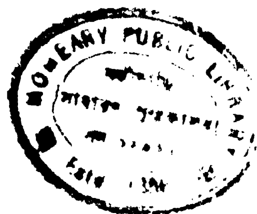
"কবিত্বের অহমিকা—
বিলুপ্ত—নিশ্চিহ্ন হবে ;
কবি মরে যাবে,—
জাগিবে সমাধি 'পরে,—
সঞ্জীবিত—ফুল্লময়—প্রাণবন্ত হিয়া
নব অনুভূতি ভরা—বিপুল গৌরবে !"

যে পাঠকেরা প্রশ্ন করবে—"হে কবি, ব্যথা ফোটাবার এত রঙ্ তুমি কোথা পাও?"—কবি তাদের উত্তর দিয়ে রেখেছেন—

"মৃদুহাসি কবি বলে—
'নিজেরেই আমি করি যে প্রকাশ
শুধু ছবি আঁকা ছলে !' "

'সাগরিকা'র সার্থকতা এইখানে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

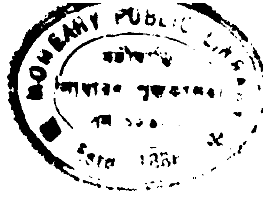




জীবন বুকে ব্যথার আলোড়ন,—
সাগরবুকে ঢেউয়ের মতো
দুল্‌ছে অনুখন ;
অনুভূতি হারিয়ে চেতন
পাষাণ হিমাচল
ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝর্ণা পারা
নাম্‌ছে অশ্রুজল।
জীবন সাথে কাব্য যখন
এম্‌নি মিলে যায়
কাঁদে কবি,—সরস করি'
সকল প্রাণে হায়!



১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২



সূচী





সাগরিকা

সাগরের ডাক

কোথা কোন্ অজানিত স্বপ্নপুরী হ'তে
আসিছে কল্লোল ভেসে
সাগরের তানে ;
দশদিক ভরে' তোলে গানে।
মনে হয় সে জগতে
আছে শুধু সুখ,—
নাহি জরা গ্লানি ;
সেথায় কহে না কেহ
দুখের বাখানি।
সেথা বুঝি হৃদয়ের
সব কিছু আশা
বাঁধে নিজ বাসা
আপনার মনে,
ফিরিতে হয় না তা'রে
কাহারও সন্ধানে ;—

পরিপূর্ণ তৃপ্তি বুঝি সেথা
এলায়েছে দেহভার তা'র
গভীর আবেশে,
তাই তা'র সুর ভেসে আসে
কল্লোল তানে
সাগরের গানে ;
মন আজ মোর উচাটন
সে পুরীর লাগি'
তাই থাকি থাকি,—
হিয়া মোর হ'তেছে বিবাগী ;
কাণে কাণে কহে যেন মোরে,—
—"ছিন্ন কর,—জগতের
মায়া-বাঁধা ডোরে,"
'সুরু হোক্ চলা,—
একান্ত একেলা,
সেই পথে
যেথা হ'তে—
আসে আজ ভেসে
সুমধুর সুর
সাগরের গানে ;
চল আজ,—যাত্রা করি,—
তাহারই সন্ধানে।'

২৪ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী

একা

নিরালা সাগরকূলে
আমি প্রাণী একা
কেহ নাই,—কিছু নাই,—সব দেখি ফাঁকা ;
সাগরের নীল জল
হাসে শুধু খল্ খল্
সীমা নাই,—কূল নাই,—কিছু নাই দেখা !

অকূল জলধি জলে
মাঝি আমি একা
দাঁড় নাই,—দাঁড়ি নাই,—তবু ভেসে থাকা !
আমার মনের ভেলা
চলিয়াছে পাল তোলা
দিক্ নাই,—দিশা নাই,—পথ আঁকাবাঁকা !

দীপের শিখাটি নিভে
আঁধারেতে একা,
আলো নাই,—জ্যোতি নাই,—সব মসীমাখা !
ঘুরিছি উদাস-পারা
হারায়ে নয়ন-তারা
আশা নাই,—বাসা নাই,—তবু জেগে থাকা !

অনাদি কালের বুকে
আমি শিশু একা,
লোক নাই,—সাড়া নাই,—মিছে শুধু ডাকা !
যেন কতকাল ধরি'
চলেছি এমন করি'
জানা নাই,—শোনা নাই,—সব ভুলে থাকা !
'একা আমি',—এ-কথাটি শুধু মনে আঁকা !

২৮ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী

ঊর্ম্মি-মালা

ঐ সাগর গলে ফুলের মালা
কে পরালে গো।
ঊর্ম্মি বুকে দুলে দুলে
কূলে লাগে গো।
শুভ্র ফুলের পাঁপড়িগুলি
কোথায় ক্ষণে যায় যে মিলি'
সাগর কূলের নিঠুর আঘাত
সইতে নারে গো।
কোমল মধুর কুসুম পরাণ
বেলায় লুটায় গো।

সাগর-বুকের মালাখানি
পরব ভাবি গলে
হাতের মুঠোয় ধরতে গিয়ে
মিলায় পলে পলে ;
কোন্ দরদীর সোহাগ গড়া
আমার হাতে দেয় না ধরা
সেই ব্যথাটি বাজলো আমার
মনের অন্তরালে ;
মালা পরার সাধটি আমার
রইল চিরকালে!

১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী

নীল সাগরের প্রিয়া

আমার নীল সাগরের প্রিয়া!
রাঙা আঁচল দোলায়ে
তুমি করলে উতল হিয়া;
ঐ সাগর-বালুর চরে
তোমার চরণ-রেখা পড়ে
সাধ জাগে মোর—বরণ করি'
বুকের আসন দিয়া;
মোর নীল সাগরের প্রিয়া!

ঊর্ম্মি-বাহু নাচি নাচি
ঐ চরণ ছুঁয়ে যায়
সেই পুলকে সাগর দোলে
এম্নি পাগল প্রায়;
ঐ চরণের একটু ছোঁওয়া
আমার কি গো যায় না চাওয়া,—
এম্নি অধম কাঙাল আমি
ভাগ্যহীন গো হায়!

তোমার একটু মুখের হাসি,—
বালুর চরে ছড়ায় যেন
মুক্তা-ফুলের রাশি,
সেই ফুলেরই গুচ্ছরাজি
ভরবে আমার মনের সাজি
দূর বিদেশেও করবে ব্যাকুল
গন্ধে, আমার হিয়া!
আমার নীল সাগরের প্রিয়া!

১৩ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী



সাগর-সাকী

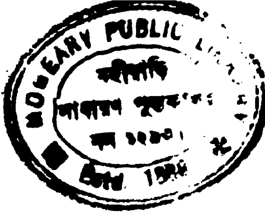
কোন্ তরুণীর বুকের তৃষা
সাগর বুকে জাগে
প্রথম প্রেমের ঢেউটি যেন
মন-কিনারে লাগে।
উঠছে সাগর ফুলে ফুলে
প্রেমের দোলায় দুলে দুলে
তন্বী-বুকের কুসুম যেন
চায় সে তরুণ মুখে ;
তেম্নি ধারা মদির বিহ্বল
প্রণয়-মধুর সুখে।

আঁচলখানি উড়িয়ে দে'ছে
নীল গগনের গায়
মেঘের ফাঁকে ঘোমটা ঢাকা
মুখটি দেখা যায়।
চক্ষে তাহার প্রেমের জ্যোতি
ঘনায়ে আনে মিলন-স্মৃতি
মৃণাল-কোমল বাহুর বাঁধন
কোন্ তরুণে চায় ;
পিয়াস ভরা বুকের বাসা—
মনটি উদাস তায়।

কোন্ অচেনার পারে আছে
তা'র সে পরাণ বঁধু
নাই কো তাহার দিক দিশানা
ব্যর্থ পিয়াস শুধু,
তবু অচিন বঁধুর লাগি'
এম্নি আকুল,—অনুরাগী
উজাড় করে চায় সে দিতে
হিয়ার গোপন মধু;
সাগর-সাকীর বুকে জাগে
মিলন তিয়াস শুধু!

১৫ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী





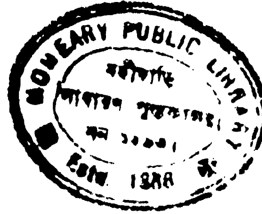
রুদ্র-জলধি

সাগরবুকে আজ প্রলয়ের
বিষাণ যেন বাজে,
রক্ত-লোলুপ হিংস্র জিহ্বা
বিশ্বে যেন গ্রাসে ;
সৃষ্টি নাশের উগ্র নেশা
আজ যেন তার রক্তে মেশা
চক্ষে তাহার বক্র কুটিল
দৃষ্টি টুকুন্ ভাসে ;
ধ্বংস-লীলার মত্ত নেশায়
মেতেছে উল্লাসে।

নটরাজের প্রলয় নাচন
আজ বুঝি বা সুরু,
সাগর সাথে তাল দিয়ে ঐ
বাজায় সে ডম্বরু ;
নীল গগনে চাঁদের হাসি
যেন উমার রূপ-রাশি
সৃষ্টি নাশের শঙ্কা হেরি'
ত্রস্তা ব্যাকুল ভীরু
আতঙ্কে আজ বিশ্ববুকে
ভয়ের 'গুরু গুরু'।

ঐ প্রলয় সাথে পাল্লা দিয়ে
আজ যে আমার মন
তাথৈ তাথৈ নৃত্য ছাঁদে
নাচছে অনুক্ষণ ;
ধরা বাঁধা গণ্ডী যাহা
নিঠুর হাতে ভাঙ্‌ব তাহা
তাদের সাথে আজকে সুরু
মৃত্যু-ভীষণ রণ
বিধির নিষেধ মান্‌ব না কো
এই করিনু পণ !

১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী





সাগর-ভীতা

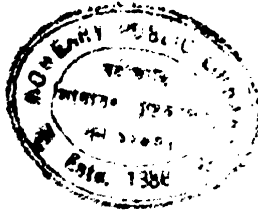
নীল সাগরের ঢেউ যে তোমার
চরণ ছুঁতে চায়
ত্রস্তপদে পালিয়ে আসা
পায় কি শোভা তায়।
ঐ চরণ দুটি পরশ তরে
দুল্‌ছে সাগর আবেগ ভরে
এম্নিভাবে পালিয়ে কেন
বিফল কর তায় ;
দয়িত প্রাণে ব্যথা দিয়ে
কি সুখ যে গো—হায়।

দেখছ না কি সাগরবুকে
আজকে ঢেউয়ের লীলা
পুলক ভরে হাত তুলে সব
কর্‌ছে মধুর খেলা ;
অন্তরে তার তোমার ছবি
রাঙায় যেন প্রেমের রবি
পিয়াস চোখে দেখে তোমার
চরণ দুটি ফেলা ;
পরশ তারে দাও না কেন—
এতই অবহেলা।

সাগরিকা

না-পাওয়া ঐ সাগর-হিয়ার
আর্ত্ত করুণ সুর
লুটিয়ে পড়ে সাগর বেলায়
ব্যর্থ বেদনাতুর ;
নেই কি তোমার একটু দয়া
ও নিঠুরা, সাগর-প্রিয়া
এম্নি কি গো নিদয় তুমি
গর্ব্বে ভরপুর ;
সাগর ব্যথা বাজবে জেনো
যাও না যতই দূর !

১৪ অক্টোবর, ১৯৩১
পুরী

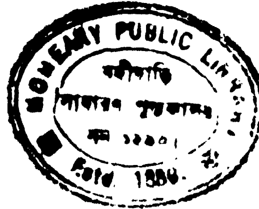


সাগর-স্নানের প্রিয়া

আমার সাগর-স্নানের প্রিয়া।
মিলন-রাখী কে পরালে
ঢেউয়ের বাঁধন দিয়া ;
যে ঢেউ তোমার বুকটি ছুঁয়ে
গায়ে আমার লাগে
জড়াই তা'রে প্রেম-সোহাগে
গভীর অনুরাগে ;
ধর্‌তে যে চাই আপন ক'রে
দেয় না যে গো ধরা
তোমার মতন সেও কি তবে
এম্নি বাঁধন হারা !

একটি আসে, একটি যে যায়
দোল্ দিয়ে যায় দেহে
দোলন-খেলা খেল্‌ছে সাগর
তোমায় আমায় ল'য়ে ;
মন-দোলাতে তোমায় পেতে
তাইতে আজি হিয়া,
উঠছে আকুলিয়া,
এক চুমুকে তোমার রূপের
পীযূষ টুকুন পিয়া ;
আমার সাগর-স্নানের প্রিয়া।

১৯ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী



সাগর-জ্যোৎস্না

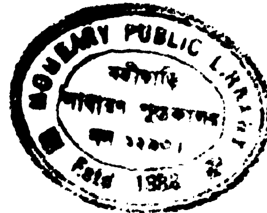
সাগর কূলে
বসি' বিরলে
জ্যোৎস্না রাতে
গাঁথছি মালা ;
তরল-রূপা
মনোলোভা
উর্ম্মিদলে
কর্‌ছে আলা ;
আজ যে আমি বাঁধন-ছাড়া
ভাবের গাঙে দিশাহারা
নীল সাগরের বুকের নাচন
দেয় যে আমায় পুলক-জ্বালা ;
জ্যোৎস্না-রাতে গাঁথ্‌ছি মালা !

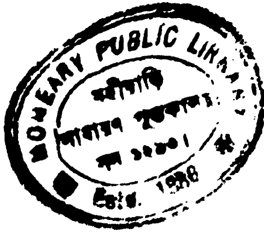
আপনি আসে
ছন্দ ভেসে
নীল সাগরের
ঢেউয়ের সাথে,
কুড়ায়ে তা'রে
বালুর চরে
কল্পনা মোর
নেশায় মাতে ;

তাই নিয়ে মোর সুরু খেলা
আজ মধুর এই সন্ধ্যেবেলা
ভাঙা-গড়া ঢেউয়ের মতন
দোল খেয়ে যায় অরূপ ছাঁদে,
নীল সাগরের ঢেউয়ের সাথে !

দিগন্তে ঐ
চোখ মেলে রই
মিলন-মধুর
কুহক-ঘেরা,
সাগর পারে
আকাশটারে
কোল দিয়েছে
দয়িত-পারা ;
আজ বুঝি তাই মিলন গানে
সুর জাগে ঐ সাগর প্রাণে
সলাজ মধু প্রেমের ভীতি
বুকটি দোলায়, দোলনা পারা ;
মিলন-মধুর কুহক ঘেরা !

১২ নভেম্বর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী





সাগর-সঙ্গীত

সীমাবদ্ধ ধরণীর কোলে
কভু—কোনকালে
প্রকাশ পেয়েছে কি গো
সীমাহীন অসীমের অফুরন্ত রূপ!
জগতের ঐশ্বর্য্য বিভব
সব কি গো মানে পরাভব
বড় ছোট সব কোলাহল
সেথা আসি', মৌন, ধীর, চুপ্

জান কি বা,—কোথা,—
স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রয়, সুখ দুখ ব্যথা
আপন সত্তারে ভুলি'
সে অসীম পানে;
মনে করে যাবে ভেসে
সব ছাড়ি', নিরুদ্দেশে
ভাল-লাগা কোন্ এক
অচেনার টানে।
নাহি ক্লেদ, নাহি গ্লানি
নাহি মিছে কানাকানি
জগতের যত কিছু ক্ষুদ্রতারে লয়ে;
প্রশান্ত হৃদয়ে,—
সেথা শুধু জাগি' রয়—
বিরাট, বিশাল যাহা, অটুট অক্ষয়!

কি বা তাহা, প্রশ্ন জাগে মনে ?
হায়, তাহা বলিব কেমনে ;
আমিও যে ধরণীর
সীমাবদ্ধ জীব ;
সীমার বাহিরে যাহা
ভাষায় ফোটে না তাহা
তবু জানি রয়েছে তা'
সত্য, চিরশিব !

বেলাভূমে উর্ম্মিরাশি
নেচে নেচে পড়ে আসি'
গর্জ্জে যেন শৃঙ্খলিত
নাগ-রাজ সম,
অনুভূতি জাগি কয়,—
'মিছে কেন কর ভয়
মাভৈঃ বারতা এই, অতি নিরুপম !'
শুনি সেই স্বস্তিবাণী
অন্তরেতে ধন্য মানি'
বিরাটের চরণেতে
নত করি শির,
বসি' হেথা বেলাভূমে, সমুদ্র পুরীর !

১১ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী



হাসি কেন

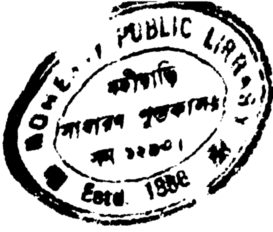
হাসি কেন ? কেন আমি হাসি ?
বিস্ময় বাড়ালে মোর
এ কথা জিজ্ঞাসি' ;
হাসিব না, মুক্ত এই গগনের তলে
গাহন করিয়া নীল জলধির জলে ?
কোথায় হাসিব তবে ?
বিশ্ব যেথা নিরন্তর
পূর্ণ কলরবে,—
যেথা সব নরকের কৃমি-কীট পারা
জনকুল, স্বার্থ লয়ে করে ঘোরা-ফেরা
আপন গণ্ডীর মাঝে ;
যেথা শুধু রাজে,—
হিংসা দ্বেষ গ্লানি, আর কুৎসা শত শত
ভাঙা-গড়া নিত্য নব নিজ মনোমত
সেই ক্ষুদ্র লোকালয়ে—
আমারে হাসিতে বল ?
তা'র চেয়ে—
হাসির ঝরণা মোর
যাক্ না শুকায়ে ;
খেদ নাই তাহে ।

হাসি মোর নহে কারু
ভৃত্য আজ্ঞাধীন
স্থান কাল পাত্র বোঝা
জ্ঞানেতে প্রবীণ।
সে যে এক দেব-শিশু
আসে কোল বেয়ে
ভালবাসে মোরে যেন
স্বরগের চেয়ে!

সাগর হাসিছে ঐ—হাসে নীলাকাশ
দশদিকে প্রকটিত, হাসির বিকাশ;
এমন হাসির মাঝে
আমি কেন হাসি?
আমারে হাসালে তুমি, এ কথা জিজ্ঞাসি!

২৫ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী





সাগর-সাঁঝে

কোন্ বঁধু সে আজকে রাতে
আসবে অভিসারে
সীমন্তে তাই সিঁদুর মেখে
লাজেই সাগর মরে ;
সাগর-বধূর সাজের ঘটা
সলাজ-রাঙা রূপের ছটা
প্রেমের তুলি বুলায় আমার
হিয়ার পারাবারে ;
সাগর-বধূর সাঁঝের রূপে
জগৎ আলো করে।

এমন সাঁঝের মোহন ছবি
রইল আঁকা মনে
পরিচয়ের স্মৃতিটুকুন্
সাগর-বধূর সনে ;
যবে সুদূর অন্ধকারে
হিয়ার আঁখি মর্‌বে ঘুরে
সেদিন মোহন এই ছবিটী
আন্‌ব আমার ধ্যানে
হৃদয় আমার কানায় কানায়
ভর্‌বে পুলক বানে !

২৬ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী

লক্ষ্মী-পূর্ণিমা

চাঁদের সুধায় স্নান করে' আজ
নীল সাগর ঐ হাসে
কোন্ সে দেবীর উদ্বোধনে
পূর্ণ অধিবাসে।

শুভ্র ফুলের অঞ্জলি ঐ
আন্‌ছে বয়ে কূলে
ভক্তি-রসে বুকটি তাহার
উঠছে ফুলে ফুলে।

সৌরভে তাই মন মেতেছে
পূর্ণ আজি হিয়া
সাগর বুকের ছবি দেখি
মনের মুকুর দিয়া।

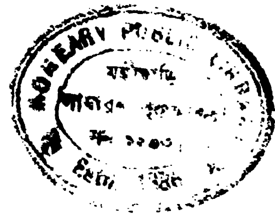
*　　*　　*

এস মা লক্ষ্মী,—অরুণ-বরণা
　　সাগর আবাস ত্যাগি'
ভকতি পুরিত অন্তরে আজ
　　দরশনটুকু মাগি।

পূর্ণিমা আজ শেজ বিছায়েছে
　　মায়া আলো-জালে ঘেরা
মোহন তোমার রূপের বোধনে
　　উজল করিও ধরা।

অকৃতি অধম সন্তান মোরা
　　জানায় মোদের নতি
বোধন শঙ্খে নিনাদি' বিশ্ব
　　ফুটুক তোমার জ্যোতি।

১৯ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী



সাগর-ঝারি

সুর যে হেথা সাগরবুকে
আপনি বাঁধে বাসা
ফেনিয়ে তোলে তাইতে আমার
রঙীন বুকের নেশা,
কল্পনা তা'র মোহন তুলি
হিয়ার পটে দেয় যে বুলি'
নৃত্য ছাঁদে ছন্দ-নটী
নেচেই হারায় দিশা ;
সুরের সাথে ছন্দ মিলি'
মেটায় গানের তৃষা।

গানের ঝরা ছড়িয়ে পড়ে
সাগর বালুর চরে
যত্নে তাদের কুড়িয়ে রাখি
মন-বীণাতে ভরে,
খাঁচায় পোষা পাখীর মত
শুনায় আমায় নিত্য কত
মোহন মধুর সুরের বুলি
যত্নে,—আদর করে' ;
পরাণ আমার ঘুমিয়ে পড়ে
ঘুম-পাড়ানী সুরে !

২৬ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী

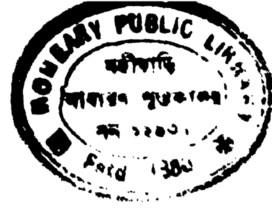


মধুরাতে

এমন রাতে কি গো
বলা যায়!
চিনিনে যা'রে,—সেই প্রিয়ারে,—
ওগো তায়!
মনের কথা,—হিয়ার ব্যথা,—
শুনিবে সে কি,—
ওগো হায়!
জ্যোছনা-বধূর,—রূপটি মধুর,—
সাগরবুকে,—আজি চায়;
এমন রাতে কি গো
বলা যায়!

জানি নে আমি,—মন-পিঁজরে,—
সারীটি আমার,—দেবে কি ধরা!
আঁকিবে সে কি,—অধর চুমি'
চুমোর রেখা,—পাগল-করা!
গুঞ্জরণে,—ক'বে কি কথা
জড়ায়ে গলে,—বাহুর লতা
মুখর বুকে,—নীরব ভাষা
মিলন গানে,—কি দেবে সায়!
এমন রাতে কি গো,—
বলা যায়!

২১ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী



সাগর-শ্যামা

শ্যামা মা তোর রূপটি হেরি
আঁধার-ঘেরা সাগরবুকে
মোহন তোর ঐ রূপের ধ্যানে
দুঃখ জ্বালা যায় যে চুকে।
মুখে তোর মা অট্টহাসি
সাগরবুকে উঠছে ভাসি'
শুভ্র ভীষণ দংষ্ট্রামালা
হান্‌ছে ছুরি আঁধারবুকে ;
রুদ্র ভীষণ মূর্ত্তি মা তুই
ধরিস্‌ যে গো কিসের সুখে !

আকাশ কোলে সাগর মেশে
দিগন্তে ঐ আঁধার কালো
এলোচুলের ঐ শোভাতে
সাজে মা তোর রূপটি ভালো !
মূঢ় তোর এই সন্তান মা
তাইতে ডাকে,—'শ্যামা,—শ্যামা'
কালো মা তোর রূপের প্রভায়
পরাণে তা'র প্রদীপ জ্বালো ;
সোনা হ'য়ে উঠুক্‌ ফুটে
পরাণ-ভরা ময়লা ধূলো !

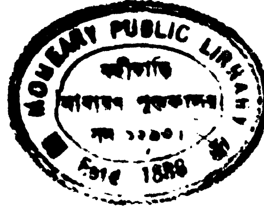
২২ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী

বাঁশীর তানে

বাঁশী বেজ না,—বেজ না,—
সাগর কূলে।
ঐ সুরের গমকে মোর
মন উথলে;
অনেক দিনের,—অনেক ব্যথা
আবরি' হিয়া,—ঢেকেছি সেথা
তারে, দিও না,—দিও না,—
জাগায়ে,—তুলে!
বাঁশী বেজ না,—বেজ না,—
সাগর কূলে!

দরদী হিয়া,—তুমি সে জানি
বুঝিবে আমার মরমবাণী
তবু যে তোমার সুরে তানে
নয়ন আমার,—ভাসাবে জলে!
বাঁশী বেজ না,—বেজ না,—
সাগরকূলে!

২৭ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী



বালুচরের স্মৃতি

সবাই দেখি, সাগর বেলায় আসি'
বালুচরের পড়া ঝিনুক
কুড়ায় রাশি রাশি ;
আমি কিন্তু দিনে রাতে
খুঁজছি আঁতিপাতি
মেলে যদি কোথাও কিছু
কুড়িয়ে পাওয়া স্মৃতি ;
একটু ছোট গান,—
ভুলের মাথায় কেউ যদি বা
ফেলেই হেথা যান্
সুর দেব' যে আমি তা'রে
কর্ব সুমহান্ !

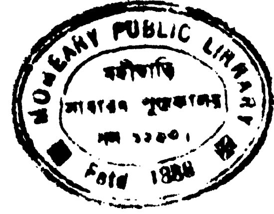
এম্নি ধারা সঞ্চয় মোর
যা কিছু আজ আছে
একটি তা'রই নিয়ে আমি
ধর্ব সবার কাছে !

পুরীর বালুর চর,—বলেছি,
সাগর করে খেলা
নিত্যি নূতন কতই রকম
সকাল সন্ধ্যেবেলা ।

একটি তরুণ, বয়েস কাঁচা
দেখ্‌তে পেতাম চরে
ফির্‌ত কেমন, দিশা-হারা
একলা ঘুরে ঘুরে;
কারেই যেন খোঁজে—
সেই কথাটি হয় তো বা সে
আপনিই না বোঝে।

ফির্‌ছে কত 'চেঞ্জার' সব
এদিক ওদিক করে'
লক্ষ্য বিশেষ করে না সে
তেম্নি কারুর পরে।
পড়্‌ছে মনে, ভোর সেদিনে
একলা যেমন যায়
তেম্নি ধারা ঘুর্‌ছিল সে
বালুচরের গায়।
নীল সাগরের সুরটি বুঝি
জাগ্‌ছিল তা'র মনে
কী যেন সে, গাইছিল তাই
মৃদুল গুঞ্জরণে।

নতুন অঙ্ক হ'ল সুরু
চাইছি ক্ষমা তায়
সমাজ-সেবী বন্ধু দলে
পাছে আঘাত পায়।

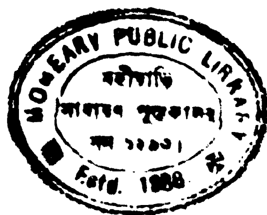


এক তরুণী, তন্বী কায়া
স্বপ্নে ছাওয়া আঁখি
বালুর চরে ফির্‌ছিল সে
চরণ-রেখা আঁকি'।
নীল সাগরের কায়ার সাথে
রাঙা আঁচলখানি—
মানিয়েছিল বড়ই শোভন
যেন—সাগররাণী!
দৃষ্টি-মিলন রাণীর সাথে
যেমন হ'ল—হায়
তরুণ বুকের ফুল্ল কুসুম
পড়্‌ল লুটে পায়।
জান্‌লে না যে—সেই নিঠুরা
নীল সাগরের রাণী
পরিচয়ের একটু ছোঁওয়া—
তা'র সে কতখানি!
এক আছিলায় তাই সে তরুণ
যখন কাছে যায়
চিন্‌লে না সে, দুটি কথায়
কর্‌লে বিদায়, হায়!
তরুণ বুকের সেই বেদনায়
বালুচরের পরে
রক্ত-রাঙা ব্যথার ঝারি
আজও বুঝি ঝরে!

—

কথার বুলি সাঙ্গ এবার
তবুও কি যে রীতি !
সুরের জালে জড়ায় মোরে
বালুচরের স্মৃতি !

২৫ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী



মনের চর

বালুর চরে
পায়ের চিহ্ন কত
পড়ল আঁকাবাঁকা
নিমেষ পরে
মুছেই যাবে হায়
নয় কো কিছু পাকা।
বালুর বুকে
বালুর রেখা টানি'
ঢাকিয়ে দে'বে তায়
ফুরিয়ে যাবে
চরের স্মৃতিটুক্,—
মনে-রাখার দায়।
থাক্‌বে তেমন
যেমন ছিল আগে
বালুর ধূ ধূ মরু
ভুলেও যে জন
জগত মাঝে হায়
পায় না সোহাগ কারু।

সাগরিকা

এম্নি আমার
মনের চরে আজ
যতই আনাগোনা
নিত্যি নূতন
সুরের তানে মোরে
করছে আরাধনা।
দুদিন পরে
মুছেই যাবে সব
দেবে না কেউ দেখা
ঊষর মরুর
ধূসর ছবিখানি
রইবে বুকে আঁকা।

২৯ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী

মুক্তির টান

চিরমুক্ত জীব আমি,—
পড়িয়াছি বাঁধা এই
সংসারের জালে
কোন্ মন্ত্রবলে ;
পঙ্গু করি' প্রতি অঙ্গে মোর
রেখেছে সংসার ঘিরি',
তাই হেথা ফিরি—
গণ্ডীর ত্রিসীমা মাঝে
কলুর বলদ যেন ;
ইচ্ছামত চলিবারে
অধিকার—
নাই বুঝি কোন !

সম্মুখে গরজি' ওঠে
বিশাল সাগর ;
নাহি বাধা,—নাহি বিঘ্ন,—নাহি কোন ডর ।
মুক্তির আনন্দে মাতি'
নাচিতেছে দিনরাতি
অসীমের সীমা টানি'—সীমার উপর ।

সাগরের এই সুর
জানায়েছে মোরে
মুক্ত আমি আজ,—কাল,—
মুক্ত চিরতরে।
তাই আজ বন্ধন যত,—
জ্বালাময় বৃশ্চিকের দংশনের মত
দহিছে অন্তরে মোর;
যত কিছু স্নেহ-বাঁধা ডোর—
দারুণ বন্ধন চাপে
আনে আঁখিলোর।
বিদ্রোহ-অনলে প্রাণ
উঠিছে জ্বলিয়া
'মুক্তি দাও,—মুক্তি দাও,—
কেঁদে ওঠে হিয়া!'

৩০ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী



বাদল দিনে

স্তব্ধ সাগর তীর
ক্লান্ত বাদলদিনে ;
জনহীন বালুচরে,—ঘুরে মরি একা,—
মনে জাগে ক্ষীণ সুর
শ্রান্ত,—ব্যথামাখা ;
এ জগতে যত কোলাহল,—
হিংসা,—দ্বেষ,—কুৎসা,—গ্লানি
তিক্ত হলাহল
এ সবে তেয়াগি,'—
হিয়া আজ,—বিমুখ,—বিবাগী ;
নাহি টান—সংসারের পানে ;
গৈরিক মনের কোণ
বৈরাগী সাগরের তানে ।

এ বাদল দিনে,—
মৌন ধীর সাগরের রূপ
নিঝুম,—গাম্ভীর্য্যময় ;
বজ্র নির্ঘোষ স্বরে
উর্ম্মি নিনাদে শুধু
মনে জাগে ভয় ;
যেন কোন্—তপঃসিদ্ধ ঋষি
যোগাসনে,—মৌনব্রতে বসি'
ফেলে দীর্ঘশ্বাস
হুহুঙ্কার রবে,—
প্রাণ উঠে কেঁপে,—
হাসি,—কান্না,—সুখ,—দুখ
অনুভূতিগুলি—
বিলুপ্ত সকলি,—
উদাত্ত,—বৈরাগীসুরে,—ভরে ওঠে প্রাণ,—
অসীম সাগর তীরে,—উদাসী পরাণ !

২৮ অক্টোবর, ১৯৩৯
সমুদ্রতীর—পুরী

সাগর-দরদী

বিশ্ববুকের সুপ্ত ব্যথা
গুম্‌রে মরে সাগর কোলে
দরদী কোন্ হিয়ার আশে
জানায় বেদন উর্ম্মিদলে ;
ভুল ভেঙে যায়
কূলে লুটায়,—
নিঠুর ধরায় সোহাগ না পায়
মৌনাহত ;—সাগরপানে
আপনি রে তাই,—ফিরেই চলে ;
বিশ্ববুকের কান্নাসুরে,—ঢেউ তোলে তাই
সাগর জলে।

দরদী মোর শ্রান্ত হিয়ায়
প্রলেপ বুলায় ব্যথার সুরে
ছন্নছাড়া উদাস পথিক
বসেছি তাই সাগরতীরে।
নেই কো আশা,—
ভাঙ্‌ল বাসা,—
সোহাগ-হারা,—হারায়ে দিশা
পুঞ্জীভূত বিশ্বব্যথায়
মনটা আজি উদাস করে ;
ঐ সুরে আজ সুর মিলিয়ে,—বাজছে রে বীণ্
প্রাণের তারে !

২৬ অক্টোবর, ১৯৩৯
সমুদ্রতীর—পুরী



মিলন রাতে

স্বপন লোকের
কোন্ সে বাণী
ভেসে আসে
সাগর-গানে ;
প্রিয়ার হিয়া
দয়িত বুকে
ঘুমিয়ে পড়ে
সে সুর শুনে।
জ্যোৎস্না-মাখা
উর্ম্মি বাহু
জড়ায়ে ধরে
বালুর চরে ;
দয়িত তনু
প্রিয়ার কোলে
বাঁধন লভে
মৃণাল করে।

ফেনিল নেশা
মদির করে
সাগর-হিয়া
আজি এ রাতে ;
প্রিয়ার বুকের
মাতাল পরশ
দয়িত হিয়ায়
পুলকে মাতে ।
দূর নীলিমায়
সাগর ছুঁয়ে
মিলন-নিশি
আজি বা পোহায় ;
অধরে অধর
নয়নে নয়ন
দয়িতজনে
চুমিছে প্রিয়ায় ।
সাগর বুকের
মিলন আশায়
মিলন জাগে
হিয়ার কোলে ;
ঢেউয়ের তালে
প্রেমের সুরে
প্রেমিক হিয়া
দোদুল দোলে ।
মধু এ রাতের
মধুর আমেজ

রইল ঘিরে
মনের পুরে ;
সাগর বুকের
দোলার মতন
তুল্‌বে ওগো
গেলেও দূরে।
আজি মিলনের
মধু এ নিশায়
মিলন সুরে
কাটাব রাতি ;
মিলিবে হিয়া
হিয়ার সাথে
জাগিবে বুকে
প্রেমের ভাতি।

৪ অক্টোবর, ১৯৪১
সমুদ্রতীর—পুরী

সাগর তানে

সীমার শেষে অসীম হেথা
মিলেছে এক সাথে
উল্লাসে তাই অঙ্গ দোলে
নৃত্য ভঙ্গিমাতে ;
নীল সাগরের শীর্ণ রেখা
লক্ষ্য শেষে রয় যে আঁকা
বালুর চরে নূপুর তাহার
ছন্দে গানে মাতে ;
অসীম-পাওয়ার সুখে সীমা
মুদায় আঁখির পাতে।

সীমার মাঝে অসীম গানের
এম্নি ধারা সুর
মনের কোণে ঘুরছে ফিরে
আনন্দে ভরপুর ;
কী বা তাহার ভাষার মানে
দিক-ভোলা মন তা' না জানে
অসীম পানে তাকিয়ে শুধু
খোঁজে আপন পুর ;
হারিয়ে যাওয়া মনে দিশা
তাকিয়ে থাকে দূর !

১ অক্টোবর, ১৯৪১
পুরী

———

বন্ধু-বিদায়

দূর বিদেশে বন্ধু তোমার
মধুর পরিচয়
সাগরকূলে দিনগুলি মোর
কর্‌লে সুধাময়।

ছোট্ট কথা, ছোট্ট হাসি
ছোট্ট মনের গান
আজকে স্মরে' মন-সারীটি
করছে তাহা ধ্যান।

ভাবছ তুমি, এমন কি তা'
রইবে কেন মনে
থামাও বন্ধু, তর্ক তোমার
ভুলের বিস্মরণে।

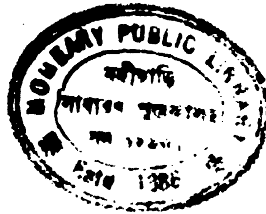
এই যে দেখ, সাগর বুকে
উঠছে এত ঢেউ
মিলায় বটে নিমেষ মাঝে
লয় পায় কি কেউ?

সাগর মণি-কোঠায় তাদের
ভাঙা-গড়া সব
অহর্নিশি করছে শুধু
আকুল কলরব।

তেম্নি জেনো, ফুরায় না সব
যা' কিছু যায় চলে
অটুট হয়ে রয় যে তাহা
আব্ছা-স্মৃতির কোলে।

ভাষায় আজি জাগছে না সব
চাইছি ক্ষমা তায়
বন্ধু-কবির বিদায় বাণী
মনেই প্রকাশ পায়।

২০ অক্টোবর, ১৯৩৭
পুরী



সাগরের টান

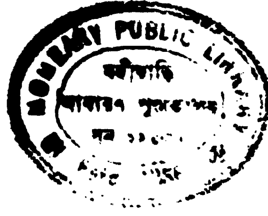
সাগর-নটীর নৃত্য দোদুল
চঞ্চল-চল কায়া
ম্লান হবে না কি, আমার বিহনে
পড়িবে বিষাদ-ছায়া।
নাগর-ভক্ত কত যে আসিয়া
বন্দনা করে তা'রে
মোর স্মৃতিটুক্ রাখিবে সে মনে
দুরাশা এমনি হা রে!

নৃত্য-পুলকে মেতেছে যেমন
তেমনি মাতিয়া রবে
কোন ব্যথা বুকে বাজিবে না তা'র
আমি চলে যাব যবে।
এমনি করিয়া মজায়ে চলেছে
কত যুগ যুগ ধরি'
প্রেমিক হিয়ার হতাশার শ্বাসে
পুলকে উঠিছে ভরি'।

তবু কি মোহন মায়ার বাঁধনে
জড়ায় আমার হিয়া
অঞ্জলি-ভরা প্রেমের অর্ঘ্য
নিঃশেষে ফেলি দিয়া।

৩০ অক্টোবর, ১৯৩৭
সমুদ্রতীর—পুরী


চিত্রলেখা



হিমালয়ের প্রতি

পাষাণ,—কঙ্করময়,—শুধু শিলাস্তূপ
অচেতন,—জড়দেহ,—হিমগিরি তুমি।
কে বলে সে,—মিথ্যা কথা!
জানে নাই,—চেনে নাই,—সে তোমারে কভু
দেখে নাই,—অন্তরের সুমহান্ ছবি
বোঝে নাই,—হৃদয়ের হাসি-কান্না, ব্যথা,—
সুপ্তিমগ্ন আছে যাহা,—চেতনার দ্বারে;
প্রাণহীনে প্রাণ দেয়?—কেমনে তা' পারে।

রাশি রাশি ফোটে ফুল,—
লাজ-রক্ত তরুণীর গণ্ড-আভা মাখি'
উচ্ছ্বসি' চলিছে হাসি'
ঝরণার জল,—
হাস্যময়া তরুণীর মধু-হাসি পারা—
'কল,—কল,—খল্—খল্—'
প্রাণবন্ত নয় কি গো তাহা,—
প্রাণহীন,—সকলি' বিফল?

৭

উষার পুলক মাখি,'—হিমগিরি শিখা
রাঙি উঠে সৌর করে,—
স্বর্ণ-রাগ আভা
মধুর প্রণয় ভাষে,—হিয়া যথা
প্রেমিকার,—রাঙি' ওঠে,—প্রেমের বরণে
উজল আলোকময়,—অতি মনোলোভা ;
আকাশের কোলে,—কোলে
হেথা হোথা দুরন্ত মেঘ-শিশু দলে
কণ্ঠ তা'র আগুলি' আবেগে,—
মাতৃস্তন্য সুধাসম—পান করিবারে,—
আকুল পিয়াস ভরে,—
কী বা যেন মাগে ;
পাষাণের অকথিত বাণী,—
নদী বহি' লয়ে যায়,—
করি' মৃদু 'কুলু কুলু' ধ্বনি ;
এ কি তবে সত্য নয় ?—শুধু মায়া-খেলা ?
এই হাসি,—এই গান,—এই সুর
এই রূপরাশি,—
প্রকৃতির অভিব্যক্তি,—জড়তার মেলা ?
নাহি মানি কোনমতে,—মানিব না তাহা,—
অনুভূতি প্রাণময়—হেরিতেছি যাহা,—
জড়,—তাহা সবে !
আজি মোর মনে লয়,—
শাপ-গ্রস্তা অহল্যা,—কোথা,—কোন্,—কবে
হয়েছে পাষাণময়,—শিলাস্তূপ রূপে
অভিশাপে,—যেন কা'র ;

চেতন আজিকে তাহার—
যেন আসে ফিরে,—
শিলাস্তূপ 'পরে ;
চেতনার অভিব্যক্তি,—তাই আজ
প্রকাশিছে,—অতি ধীরে ধীরে।

অভিশপ্ত কাল তব,—হয় নি কি গত ?—
এতদিনে,—এত যুগে,—এতকাল ধরি'
হে হিমাদ্রি গিরি !
জাগো,—জাগো,—সাড়া দাও
পাষাণের আবরণে
ফে'ল আজি খুলে,—
পরিপূর্ণ মূর্ত্তি লভি'—জেগে ওঠ দেবী—
জাগুক্ পরাণ তব,—
সুপ্তিমগ্ন এতকাল,—যাহা শিলাতলে।

১১ অক্টোবর, ১৯৪০
দার্জ্জিলিং, স্নো-ভিউ হোটেল



হিমালয়-বন্দনা

মেঘের মেলা
আমি একেলা
পাহাড় কোলে
বসি' নিরালায়
দূরে হিমালয়
শান্তি নিলয়
গগন-চুম্বী—
ঐ দেখা যায় ;
যেন এক ঋষি
যোগাসনে বসি'
লভেছে সমাধি
এই মনে লয়
সাধনার কালে
শ্বেত জটাজালে
শির আবরি'
যুগ গত হয়।
জগতের দুখে
বেজেছিল বুকে
কেঁদেছিল হিয়া
তাই সে কারণে
কিম্বা কোন কি
নিজ ব্যথা লাগি'
যুগ যুগ ধরি
বসি' যোগাসনে।

কবে কোন্ ক্ষণে
কী শুভ লগনে
এ সাধনা সুরু
নাহি তা'র চিন্
তরুণ তাপসে
কো[illegible]লাষে
[illegible]নার সুরে
বেঁধেছিল বীণ্।

* * * *

হে বিরাট ঋষি
আঁখি জলে ভাসি
মৌণ মহিমা
নিরখি নয়নে
সুখ দুখ তাপ
শোক সন্তাপ
তেয়াগি সকলি
ও রূপ স্মরণে।
নমো নমো নমো
পুরুষোত্তম!
চরণে তোমার
অশেষ নতি
পাপে তাপে ভরা
দীনহীন মোরা
তুমি খুঁজে দিও
মোদের গতি।

৬ অক্টোবর, ১৯৪০
অব্জারভেটারী হিল্, দার্জ্জিলিং।



প্রিয়ার পরশ

আমার প্রিয়ার আঁখির আলোকে
নিখিল প্রিয়ারে হেরি
স্বচ্ছ,—নীলাভ, খঞ্জন-আঁখি
সারা বিশ্বের প্রেম-সুধা মাখি'
চির-অপলক স্বপ্ন-মাধুরী
আবেশে—রাখে যে ঘেরি' ;
যেথা যত দুখ,—ব্যথা কল্লোল
বিরহীর প্রাণ,—করে উতরোল
তা' সবে আমার,—বড় আপনার
মধু ব্যথা-মাখা—দুখ-সম্ভার
মরমী হিয়ার দরদ মাখায়ে
লয়েছি হৃদয়ে বরি' !

নাহি আজ ভিন্,—নাহি আজ পর
নয়নের নিদ্ ঝুরে,—ঝর ঝর্
নিখিল-বিশ্ব-ব্যথার লাগিয়া
পরাণ গুমরি' উঠে,—
ব্যথিত হিয়ার তটে ;
হাসি-কান্নার কুড়ানো মাণিকে
ভরেছি আমার ছেঁড়া ঝুলিটিকে
অবসরকালে নাড়ি' চাড়ি' তাই
করি বসে' কত খেলা,—
আমায় করে না হেলা ;
দেয় মোরে কত বিরহীর দুখ
ক্ষণিকের পাওয়া,—চকিতের সুখ
কৃতজ্ঞতায় পরাণ ভরিয়া
চরণ-ধূলায় লুটে।

কোথা মোর প্রিয়া—গে'ছে কতদূর
নাহি জানি আজ,—কোন্ সে সুদূর
পরশ তাহার অন্তরে মোর
দিল কি,—ফল্গু বহি' !
বিরহীর সাথে ডুকারি' কাঁদি যে
ব্যথিতের ব্যথা বড় বুকে বাজে
প্রেমিকেরে বাঁধি বাহুর বাঁধনে
বিভোর হইয়া রহি।

মোর প্রিয়া আজ,—বিশ্বের মাঝে
নিখিল হিয়ায় স্থান খুঁজে নে'ছে ;
আমার প্রেমের পশরা উজাড়ি'
বিশ্বে ছড়ায়ে দে'ছি ;
প্রেমিক,—বিরহী,—কে আছ কাতর
এস সবে আজ,—করি সমাদর
দরদী আমার হিয়ার প্রলেপে
তোমাদের ব্যথা মুছি ।

নাহি আজ কিছু,—একা আপনার
যা' ছিল আমার,—আজি সবাকার
আমার প্রিয়ারে বিশ্বের মাঝে
বিলায়ে,—হয়েছি হারা ;
আমার প্রিয়া যে,—নিখিলের ধন
নিখিলের প্রিয়া,—আমার রতন
প্রিয়ার পরশ বিশ্বে খুঁজিয়া
ফিরি' পাগলের পারা ।

৮ অক্টোবর, ১৯৪০
দার্জ্জিলিং, স্নো-ভিউ হোটেল ।

হিমালয় দর্শনে

তুমি কবি!
বিশ্বের সুষমা রাশি
ফোটাবার লাগি'
গর্ব্বভরে আঁক' কত ছবি
প্রাণের দরদ দিয়া,—
সার্থক রচনা ভাবি'
ফিরে ফিরে নিরখিয়া
তৃপ্ত ক'র আপনার হিয়া।
কিন্তু হায়,—চক্ষু মেলি'
দেখেছ কি চেয়ে
বিশ্বের ভাণ্ডার পানে,—
যেথা নিত্য নব নব
সৌন্দর্য্যের দানে
পরিপূর্ণ মহোৎসবে
জাগিছে কেবলি
পুঞ্জীভূত শত শত—সৌন্দর্য্যের
হীরা,—রত্নাবলী—
অব্যক্ত,—মহিমাময়;
হায় কবি! কণাটুকু তা'র
ফোটাবারে সাধ্য যদি
থাকিত তোমার
সার্থক জনম তব,—অন্তরে মানি'
শ্রদ্ধাঞ্জলি পদে তব
নিবেদিতাম,—জেন সুনিশ্চয়।

ঐ যে দিগন্তব্যাপী
হিমালয় গিরি
উচ্চ করি' শুভ্র শির
রয়েছে দাঁড়ায়ে
সৌরকরে সমুজ্জ্বল,—দীপ্ত প্রভা লয়ে',—
স্তরে স্তরে ফেন-শুভ্র
মেঘমালা ঐ,—
হিমাদ্রি পিতার বক্ষ
নির্ভয়ে আগুলি'
করিতেছে লুকোচুরি খেলা,—
হে কবি! শক্তি যদি থাকিত তোমার
ফুটাবারে ও নিখুঁত রূপ,—
প্রকৃতির এ বিচিত্র লীলা,—
নত আমি করিতাম শির
তোমার কৃতিত্বের দ্বারে;
কিন্তু হায়! কোথা পাবে হা রে!
ঐশী সে শকতি তুমি;
তুমিও যে জীব,—সীমাবদ্ধ আমাদের মত,—
ভাব তব ভাষা খুঁজে
ফিরে আসে,—মৌন,—ব্যথাহত!
পরাজিত তুমি তাই কবি,—
তুমি আঁক ছবি
হিয়ার দরদ দিয়ে
ফোটাবারে সুষমা-সম্ভার;
কিন্তু হায়,—বারে বার—
ব্যর্থ হয়,—প্রচেষ্টা তোমার।

তা'র চেয়ে,—এস মোর সাথে
আঁখি মেলি' চাহি রও,—
টেনে লও,—অন্তরের পথে
অপূর্ব্ব এ হিমাদ্রির অপরূপ লীলা;
ভুলে যাবে,—করিবারে,– শুধু ছেলেখেলা
ভাষার তুলিকা লয়ে;
অন্তরে উঠিবে জাগি'
অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ ছবি;
কবিত্বের অহমিকা,—
বিলুপ্ত,—নিশ্চিহ্ন হবে;
কবি মরে যাবে,—
জাগিবে সমাধি 'পরে,—
সঞ্জীবিত,—ফুল্লময়,—প্রাণবন্ত হিয়া
নব অনুভূতি-ভরা,—বিপুল গৌরবে!

৫ অক্টোবর, ১৯৪০
জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং।

———

স্বপন-ঘোরে

প্রিয়া চলে গে'ছে,—
ফিরে আসে,—বারে বার
চুম্বন তাহার,—
নিদ্রিত আঁখির পাতে
মধুর আবেগ-ভরা
ঘোর রজনীতে ;
দিবালোকে দেয় না সে ধরা !
সেই হাসি,—সেই দিঠি,—সেই ভালবাসা,—
মুখর বুকের সেই,—মৌন মূক ভাষা,—
তেম্নি সজীব হ'য়ে,—
জেগে ওঠে প্রাণে
নিশার স্বপনে !

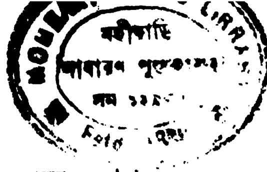
হায় স্বপ্ন ! কেন তুমি,—এ হেন চঞ্চল ?
ধরা দিয়ে,—দাও না যে,—
মায়াবিনী নিঠুরার,
তুমি,—ক্রূর ছল !
সুষুপ্ত স্মিরিতি-দ্বারে,
জর্জ্জরিত করি' কশাঘাতে
বক্র ক্রূর হাসির ঝলকে,—
গভীর পুলকে,—
সঞ্জীবিত করি' তো'ল
ঘুমন্ত বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে ;

সে আঘাতে,—
করুণ ব্যথার্ত্ত সুরে,—জেগে ওঠে হিয়া
খোঁজে তা'র হারানিধি,—
ক্রন্দনের সকরুণ বিরহিণী সুরে
'প্রিয়া,—প্রিয়া,—প্রিয়া !'
ওষ্ঠে তা'র ব্যথার কম্পন ,—
সসাগরা ধরণীর আকুল ক্রন্দন
উদ্বেলিত বক্ষে চাপি'
আঁধারে হাতাড়ি' মরে ;
সেই ক্ষণে তা'রে,—
চকিতে ছাড়িয়া যাও,—
মায়াবিনী,—তুমি নিশা-চোর !
গুটাও কুহক জালে,—
অন্তরে জাগায়ে দিয়ে,—
ধিকি ধিকি—ব্যথাতুষানলে !

নিঠুর,—নির্ম্মম,—এ কী পরিহাস তব
অদৃষ্টের সাথে ;
কেন,—কোন্ মতে,—
জীবনের হাসি-কান্না লয়ে
পাথরের নুড়ি ভাবি'
কর' ছেলে-খেলা
আপন খেয়াল ভরে ;
ব্যথিত হিয়ার লাগি,'—এতটুকু কৃপা
সঞ্চিত রাখ' নি কি
তোমার অন্তরে ?

জান না কি,—বোঝ না কি,—
কী দারুণ ব্যথা
সাহারার কী মরু-নিশ্বাস
ঘুমন্ত শিশুর পারা
সুপ্ত আছে,—অন্তরের সুগভীর কোণে ;
কেন তারে' ক্ষণে ক্ষণে,—
জাগাও নিঠুর ঘায়ে,—
মায়াবী স্বপন।
করি নিবেদন,—
জাগায়ো না,—জাগায়ো না,—
সে অনল-শিখা ;
অসহ বৃশ্চিক সম অব্যক্ত সে জ্বালা,—
লুপ্ত তা'রে করি' দাও
বিস্মৃতির অতল তলে,—
প্রাণহীন,—সাড়াহীন,—
চির মসীমাখা !

৬ অক্টোবর, ১৯৪০
দার্জ্জিলিং, স্নো-ভিউ হোটেল
রাত্রি ৩টা।



স্মরণে

পাহাড় কোলে মেঘের দেশে
একলা ঘুরে মরি
মন উদাসী,—আজকে হেথা
তোমার কথা স্মরি।
বন-বাগিচায় ফুল ফুটেছে
রঙ বেরঙের কত,—
বর্ণ তাদের,—তোমার দুটী
পাতলা ঠোঁটের মত।
হাওয়ায় দোলে,—মোহন শোভা
ঠোঁটের কাঁপন পারা
আকুল সোহাগ পরশ মাখি'
চুম্বনে হয় হারা।
এমন মধুর মোহন শোভা
আজ সকলি বৃথা
উতল আমার হিয়ায় জাগে
তোমায় পাওয়ার কথা।
মেঘ জমে ঐ পাহাড় কোলে
স্বপন পুরীর নেশা
এম্নি ধারা আমার মনে
তোমার স্মৃতি ভাসা!

স্নো-ভিউ হোটেল
দার্জ্জিলিং

বিদায়কালে

পাহাড় কোলে,—মেঘের ছায়া মত,—
বিদায় কালে,—হিয়ার কোলে,—বন্ধু স্মৃতি,—
আনাগোনা,—কর্‌ছে কত শত !
মধুর হাসি,—মধুর কথা,—ফুল্লপ্রাণের মধুর আলাপন,—
সব কিছু গো,—রঙীন যেন,—
দিগন্তে ঐ ছাওয়া ঘেরা,—
পাখা-মেলা,—
হাল্কা মেঘ মতন ;
জেগে ক্ষণে,—মিলিয়ে যে যায়
দূর পাহাড়ের কোলে,—
জেগে ওঠে,—নূতন মেঘের কায়া ;
বিদায়কালে,—তেম্নি আমার
স্মৃতিখানি ভুলে
জাগিয়ে তোল,—নতুন জনে পাওয়া ;
বিদায় বন্ধু,—বিদায় আজি,—
কঠিন প্রাণে,—ভোল আমার স্মৃতি
জাগিয়ে তোল,—নতুন গানে,—নতুন প্রাণে,—
নতুন বন্ধু-প্রীতি !

স্নো-ভিউ হোটেল
দার্জ্জিলিং



কবির প্রতি

হায় কবি !
ব্যথার তুলিতে অশ্রু লেপিয়া
আঁকিয়াছ কত ছবি !
কেহ কাঁদি' হায়
ভূমিতে লুটায়
কেহ বা হারায়ে সব,—
ঊর্দ্ধ নয়নে
বিধাতার পানে
তুলে মিছে 'হা হা' রব ;
মূক অভিমানে কেহ,—
ধরণী-ধূলায় মিশাবারে চাহে
জীর্ণ তাহার দেহ ;
কেহ বা হাসির রোলে,—
বুক-ফাটা তা'র কান্না ঢাকিয়া
সবারে চলেছে ছলে' ।
পাঠক শুধায় তাই,—
'ব্যথা ফোটাবার এত রঙ তুমি
কোথা পাও,—কবি-ভাই !'
মৃদু হাসি' কবি বলে,—
'নিজেরেই আমি করি যে প্রকাশ
শুধু ছবি-আঁকা ছলে !'

১৩ এপ্রিল, ১৯৩৪

শূন্য-হিয়া

কী যেন আজ লিখ্‌তে গেনু
জীবন-খাতার শূন্য বুকে
ফুট্‌ল না কো কালির রেখা
আঁচড় শুধু কাট্‌নু ঝোঁকে।
রুদ্র দুখের নিদাঘ-তাপে
পাষাণ পারা কঠিন হয়ে
শ্মশান মাঝে শবের মত,—
স্থিতিটুকুন্ গে'ছে রয়ে।
চেতন সেথা ঘুমিয়ে গে'ছে
কোন্ অতীতে,—কেই বা জানে
চিন্তায় তা'র,—অন্ত না পাই,
পাইনে দিশা,—শতেক ধ্যানে।
ঝল্‌সে-যাওয়া বক্ষে তাহার
স্মৃতির রেখা,—এতই ভাসা
তন্দ্রা ভরে ঝিমিয়ে পড়ে
কল্প-লোকের রঙীন নেশা।
আগ্‌লে রেখে সবখানি তা'র
অসাড় হয়ে রয় গো সেথা—
শূন্যতারই বৃহৎ কায়া,—
চেতন-হারা সুখ ও ব্যথা।

২১ জুন, ১৯২৮

প্রার্থী

জীবনের মধুভাণ্ডটুক্
রেখেছিনু
সঙ্গোপনে ঢাকি' ;
তুমি কেন,—লয়ে
লুব্ধ আঁখি
আসিয়া দাঁড়ালে দ্বারে।
হাসি-মাখা মুখে কেন,—
বল,—অভাগারে
কহিলে সোহাগ-বাণী,—
"দাও মোরে প্রিয়।
আমি এরে সযতনে রাখিব,—জানিও !"

তব কথা শুনি,—
ধমনীতে বয়ে গেল,—শঙ্কা-শিহরণি ;
মনে হ'ল,—
'জীবন-প্রভাতে,—
স'পে দেব পাত্রখানি
অচেনার হাতে ?'
'যদি সে নিঠুরা হয়,—
ফে'লে সে ভাঙ্গিয়া
গড়িব জীবন-পাত্র
আর কি বা দিয়া ?'

তাই হাসি' তোমা,—
ফিরাবারে চেয়েছিনু
নিঠুরের সমা;
জান তুমি,—তারপরে
কেমনে,—কি করে,—
ঘুচালে সে ভয় মোর;
জাগায়ে পুলক-আশা,—
মোর বুকে নিজ হাতে বেঁধে নিলে বাসা!

মনে কি পড়িছে তব?—
সেইদিনই,—
জীবনের মধুভাণ্ডখানি,—
সঁপে দে'ছি, দ্বিধাহীন মনে;
গভীর পুলক ভরে,—তোমারই চরণে!

আজ যদি,—
সেই দান লাগি'
বিনিময়ে,—
কিছু চেয়ে থাকি,—
হয়েছে কি,—অপরাধ মোর?
ব'ল আজি,—ব'ল মন-চোর!

জানি আমি,—
মোর এই দাবী—
রহিবে না,—চিরদিন জাগি',—
শিশুর আব্দার সম,—
নিত্য নব পেতে-চাওয়া বর্ণে অনুপম !
তবু মোর,—সবটুকু দিয়ে
হে নিঠুরা প্রিয়ে !
চাহিনু যে ক্ষণিক-মিলন,—
বৃথা হবে,—সেই নিবেদন ?
ব্যর্থ হবে,—শেষ সাধ মোর ?
ব'ল আজি,—ব'ল মন-চোর !

২১ এপ্রিল ১৯৩৪

ব্যথার পরশ

সুখের তিয়াসা মিটেছে আমার
দুখের দহনে দহিয়া
মিলন পিয়াসা করেছি সফল
দীর্ঘ বিরহ সহিয়া।
অন্ধ নয়ন ঘন তমসারে
আলোক মানিয়া লয়েছে
অশ্রুর মাঝে নয়ন আমার
হাসিরে খুঁজিয়া পেয়েছে।

মরুর নিশাস জুড়ায়েছে দেহ
মধুর চামর ব্যজনে,
পুষ্প-পরাগ মানিয়া লয়েছি
তপ্ত বালুকা দহনে।

নিঠুর আঘাতে পরাণে আমার
প্রেমের পরশ লেগেছে
বাঞ্ছিত-দেওয়া অবহেলা যত
সোহাগ বলিয়া জেনেছে।

চরণ আঘাতে ধন্য হয়েছে
হৃদয়-অর্ঘ্য আমারি
বিদায়-বেহাগে বাজিয়া উঠেছে
মিলন-মধুর বাঁশরী!

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

অনুযোগ

কোন্ অধিকারে শুনি ?
মৌন করে দিতে চাও,—অন্তরের বাণী ;
বসন্তের সুরভি নিশ্বাসে
রূপে,—রসে,—বাসে
যে ফুল উঠিল ফুটি'
নিভৃত হিয়ায়
নিঙাড়ি' আপন বক্ষ
সৌরভ বিলায়
ছিন্ন তা'রে করিবারে
চাও,—কেন শুনি ?

কি ক্ষতি করিতে পারে
এতটুকু ফুল ?
ফুটে-ওঠা বোঁটা' পরে
নহে তার ভুল !
কেন তবে,—
তা'র লাগি সবে
হেন প্রতিকূল ?
ব'ল,—ব'ল,—শুনি,—
না শুকাতে,—বোঁটা হ'তে,—কেন লবে ছিনি !

বিলায়েছে রূপ ?—ছড়ায়েছে বাস ?
এই তা'র দোষ ?
এর লাগি' হিয়া মাঝে
পুষিয়াছ রোষ ?
হায় রে মানব,—
লয়ে এই জগতের নিকৃষ্ট বিভব
বিচার করিতে চাও
সূক্ষ্ম গুণ দোষ ;
হয় আফ্‌শোষ !
শুধু খেলা গণি'—
কোমল প্রবৃত্তি লয়ে খে'ল ছিনিমিনি !

তাই আজি হায় !
ক্ষণিক জীবন তা'র
ক্ষণিকে ফুরায় ;
দলগুলি তা'র
ঝরে অনিবার
তরুণীর আঁখি-ঝরা
অশ্রুলোর পারা ;
হ'য়ে অভিমানী—
ধরায় মিশাতে চায়,—বুকের কাহিনী !

৪ নভেম্বর, ১৯৩২

অভিমানী

কথা আমি কইব না আর
মুখটি বুজে থাক্‌বো পড়ে
জগত মাঝে জড়ের মত
কাঁপ্‌বো না আর ঝঞ্ঝা ঝড়ে।
ফাগুন দিনের উতল হাওয়া
নাচ্‌বে যখন গানের সুরে
আগল আমি ধর্‌ব চেপে
রাখ্‌ব মোরে আড়াল করে'।
গন্ধ-বহ আস্‌বে যখন
গন্ধরাজের গন্ধ লয়ে
নিশ্বাসে মোর রুদ্ধ করে'
মর্ত্ত্যপানে রইব চেয়ে।
ভোরের আলো উষার সাথে
কর্‌বে যবে কোলাকুলি
কাজ্‌লা রাতের কাজল দিয়ে
চক্ষু 'পরে পর্‌ব ঠুলি।
চাঁদ্‌নী রাতে ফুল্ল কুমুদ
হাস্‌বে যখন দীঘির 'পরে
কান্না-হাসি হাস্‌ব শুধু
অশ্রুটুকুন্ গোপন করে'।

দীরঘ্ শ্বাসের রুদ্ধ ব্যথা
ঘুর্‌ছে ফিরে হৃদয়-কারা
জান্‌ছি আমি, জান্‌ছি সবই,—
রইব তবু পাষাণ পারা।
অবহেলার সুযোগ নিয়ে
মনটা যদি উঠে ক্ষেপে
বজ্র-কঠোর মূর্ত্তি লয়ে
টুঁটি তখন ধর্‌ব চেপে।
এম্নি করেই আপন রেখা
মুছ্‌ব আমি জগত হ'তে
ব্যর্থ প্রাণের গোপন কথা
জান্‌বে না কেউ কোন মতে !

২৩শে জুন, ১৯২৮



তৃষা

জীবনের শ্রেষ্ঠ ডালিখানি
যা'রে দিনু আনি'
সে গিয়াছে চলি' ?
যাক্,—ক্ষতি কি বা তাহে ?—
সার্থক তো' হয় না সকলি !
এ জগতে কে বলিতে পারে,—
'লভিয়াছি সব,—
যাহা আমি চাহি লভিবারে' ;
অসংখ্য বাসনা শুধু
জেগে উঠি' মনে
ভাঙ্গে খণে খণে
সাগরের বেলাভূমে
ভগ্ন ঢেউ পারা
স্তব্ধ,—ধীর,—তেজহীন,—শান্ত,—গতিহারা !

১

আমি তবে কেন করি শোক
আমার সুখের লাগি' ?
স্পর্শ তা'র,—কেন ফিরে মাগি ?—
চাহি কেন,—তা'র দরশন ?
বুঝেও,—বুঝি না কেন,—
এ কি প্রলোভন !

এসেছিল নিজ হ'তে,—
বেসেছিলো ভালো।
দিয়াছে অধর-চুমা
সুধা ঢল-ঢল।
এই মোর সঞ্চিত ধন—
তাই লয়ে কেন নাহি রহি নিমগন ?
কেন বারে হায় !
কাঙালের প্রায়,—
তাহার বিদায়-পথে
মন পিছু ধায় !
পারিবে না ফিরিতে সে,—
গে'ছে সে যখন !
কেন তবু,—লুব্ধ মোর মন ?

২৩ এপ্রিল, ১৯৩৪

সফল-ব্যর্থতা

সুখ আসে বুঝাইতে
        দুঃখের গরিমা
দুঃখ সাথে উঁকি দেয়
        সুখের কামনা।

মিলন,—সে তো' বিরহের
        অযাচিত দান
তাই তা'র অনুভূতি
        এত সুমহান্।

তমসা নামিয়া আসে
        সন্ধ্যা-বাস পরে'
অলক্ষ্যে আলোর জ্যোতি
        ফোটাবার তরে।

মরণ?—সে তো' জীবনের
        পরিপূর্ণ রূপ
জীবন-যাত্রার পথে
        মৃদু গন্ধ-ধূপ!

বিফল হইত না কি
স্নেহ,—অনুরাগ
যদি না থাকিত ধরায়
অভিমান,—রাগ।

আশার উন্মেষ লাগি'
নিরাশায় আজি
ভরে ল'নু জীবনের
চির-শূন্য সাজি।

সফল-ব্যর্থতা আজ
বড় মোর প্রিয়,
বিশ্ব-বিনিময়ে তায়
দিব না জানিও!

১১ মে, ১৯৩৩





পূর্ণ-ভিক্ষা

হিয়ার শূন্যতা বহি'
একা চলেছিনু পথে
যবে নিরালাতে—
সেদিন এ দীন লাগি'
কেহ মৃদুহাসি'
দিল কৃপারাশি
কেহ দিল সোনা,—
হায়! তবু ভরিল না ;
জীবনের ছিদ্র পথে
একে একে গলি'
শূন্য শুধু পড়ে র'ল
জীর্ণ ভিক্ষা ঝুলি !

বুভুক্ষু অন্তরের
শুষ্ক মরু-তৃষা
হারালো আপন ভাষা
মূক অভিমানে ;
জমে ওঠে ধূলিরাশি
জীর্ণ ঝুলিকোণে।

সে ধূলির মাঝে
কেমনে যে,—
উষার নীহার সম
স্নেহ কণাটুক্
ফুটে ওঠে ভরে' দিলে
তৃষা-ভরা বুক,—
ভিখারী জানে না তা'—
হর্ষে শুধু ব'য় প্রাণে,—মূক নীরবতা।

সে নীবব ভাষা—
অশ্রু মাঝে খুঁজে পে'ল
প্রকাশের দিশা ;
অঝোর বাদল ধারে
কহে সে কেবলি,—
'শূন্য নহে,—পূর্ণ আজি
ভিখারীর ঝুলি !'

২০ জানুয়ারী, ১৯৩৪

সান্ত্বনা

হারানো দিনের আঙিনা ঘেরিয়া
ছড়ানো তাহার গান
নিঠুর ছলে যে ভুলায় আজিকে
বরষের ব্যবধান।

মনে হয় যেন
এই সেদিনে সে
উঠেছিল ফুটে
হৃদয়-আকাশে
অমিয়-ঝরানো হিয়া-সুধা রসে
করেছিনু যেন স্নান ;
'সেদিন' যে মোর স্মিরিতি-পাঁজিতে
নহে বহু দিনমান।

এতটুকু হাসি
এতটুকু কথা
মৌন চাহনি
মূক নীরবতা
হৃদয়ের পটে সব আছে আঁকা
দিন শুধু অবসান !
হারায়েছি তারে,—কি গো চিরতরে ?—
না,—শুধু এ অনুমান !

২৯ জানুয়ারী, ১৯৩৪

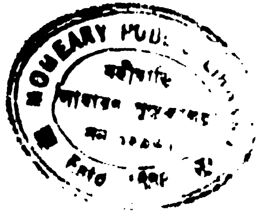


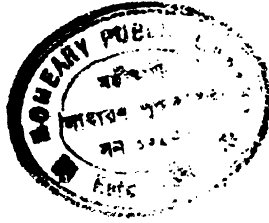
ব্যথার হাসি

আমার সাথে পাল্লা দিয়ে
আয় রে তোরা হাস্‌বি কে রে
হাঃ,—হাঃ,—হাঃ,—কল্‌জে ফাটা
অট্টহাসির ঝর্ণা ঝরে।
হাস্‌তে তোরা জানিস্ নে কো
কান্না তো তাই তোদের পোষা
মুচ্‌কি হাসির অন্তরালে
বুকটা তোদের অশ্রু ঠাসা।
মেয়ের মতন তাইতে তোরা
ফুঁপিয়ে উঠিস্ বুকটা চেপে
ভাবিস্ বুঝি ঘুচ্‌বে জ্বালা
অশ্রু জলের প্রলেপ লেপে!
নিরেট,—বোকা,—মূর্খগুলো,—
হতচ্ছাড়ার লক্ষ্মী ছেলে—
রাবণ চিতার রক্ত-জিহ্বা
কর্‌বি শীতল,—অশ্রু ঢেলে?
হাঃ,—হাঃ,—হাঃ,—পাচ্ছে হাসি
আবার খানিক হেসে নি রে
রুধির তো নয়?—রক্ত-জবা,—
মুখ হ'তে যা' পড়্‌ছে ঝরে।

পাগলী দুখের পূজার ডালি
কান্না দিয়ে যায় কি ভরা ?
কাষ্ঠ-হাসির অর্ঘ্যতে তাই
ঢাল্‌নু বুকের শোণিত ধারা।
হাসির দাপে ছিঁড়ুক শিরা
মুখের পরে উঠুক্ ভাসি'
খিল্‌খিলিয়ে যেমন জাগে
শ্মশান বুকে পিশাচ-হাসি !

২৮ নভেম্বর, ১৯৩২





সন্ধানী

গানের হাওয়া লাগ্‌ছে কেন
আজকে মনে
অকারণে—
এল কি আজ
সুরের বেশে
হারিয়ে-যাওয়া
মোর প্রিয়া সে
ধরা দিয়ে,—দিলে না কো
যে জীবনে—
আজকে কি গো—সেই মানসী
এল গানে,—আমার প্রাণে
অকারণে !

ওগো আমায় বল্ না তোরা
এই গানে কি তা'রে পাব
শুক্‌নো আমার মালাখানি
ঐ চরণে বিকিয়ে দে'ব !
কণ্ঠহারা মোর সুরে কি
সাড়া দেবে পরাণ-সাকী
জীবনে যে দিলে দাগা
রুধ্‌লে হিয়া,—অভিমানে
সে কি গো আজ,—আপনা হ'তে
আস্‌বে ভেসে,—সুরের বানে
আমার প্রাণে—
অকারণে !

৪ জুন, ১৯৩৩



চোর

চোর বল কা'রে ওগো
কে গো হেথা চোর নয়
চুরি করা বল কা'রে
চুরি করা কা'রে কয় ;
গোপনেতে কেড়ে নিলে
যদি চুরি করা হয়
তবে বল এ জগতে
আর সাধু কে বা রয়।
সাধু বল যারে তুমি
সে যে ওগো বড় চোর
জান কি রে তা'র দোরে
বাঁধা কা'র হৃদি-ডোর।
ফুল-মধু চোরা অলি
বায়ু লুঠে বাস তা'র
কেন আসে প্রজাপতি
জুটে তা'র চারিধার।
উষা-লোক করি চুরি
লাজে রাঙা ফোটা-ফুল
মধুচোরা চুপি চুপি
বলে,—'বঁধু মুখ তুল্' ;

'কুহু কুহু' ডাকে পিক,—
এ কি কভু তা'র গান
চুরি করা বুলি এ যে,
প্রেমিকার হৃদি তান ;
আকাশের নীলিমায়
চুরি কারো যায় প্রাণ
পথ-ভোলা হয় কে বা
শুনি কোন্ বাঁশীতান।
চুপি চুপি শরতের
মধুময়ী জোছ্‌নায়
বুক মাঝে চুরি করা
চাঁদে লয়ে নদী ধায়।
সকলের সেরা চোর
'ননী-চোরা' নাম তা'র
হৃদি-চোরা ছিল সে যে
রাজা হল মথুরার।
তাই আমি চাই ওগো
চুরি করে দাও দেখা
ক্ষণিকের চুরি নয়
চিরতরে ওগো সখা !

১৩২৭ সাল

স্নেহ-বিরাগী

কৃপা কণা দানে ঋণী রে'খ মোরে
স্নেহের নিগড়ে বেঁধ না
করের পরশ দিও,—যদি চাহ
হিয়ার পরশ দিও না।
কাতরতা হেরি' দয়া হয় মনে,
হিয়া মাঝে পাও যাতনা?
হাসি দিয়ে তবে তুষিও তাহারে
অন্তর-মধু দিও না।
ব্যথার মাণিকে যে আঁধার পুরে
নিভৃতে জ্বলিছে আপনা
আলোর উজল তুলিকা পরশে
নিষ্প্রভ তা'রে কোর' না।
শত করুণায় লাঞ্ছিত হিয়া
ধন্য করিতে চেও না
হৃদি-নির্ঝর স্নেহ সিঞ্চনে
মৃত্যু-যাতনা এন না!

৬ মার্চ্চ, ১৯৩৩

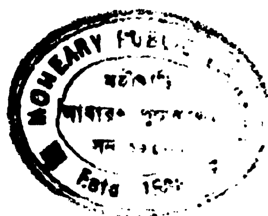
আয় ফিরে আয়

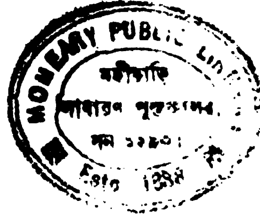
আয় ফিরে আয়—
মনের পাখী,—
আয় ফিরে আয়,—
আপন কুলায় !
দিক-ভোলা কোন্
গানের সুরে
ডাক দিয়ে ওই
নীড় হারারে
মিলিয়ে গেল নিমেষ মাঝে
সুদূর কিনারায় ।

সুরটি তাহার
আজও ভাসে
ওই ওপারের
নদীর শ্বাসে
কেমনে আজ ফির্বে পাখী—
ভাব্ছে বসে,—হায় !

আপনি মনে
ভাবিস্ বসে
ছুটবি পাখী
হারার দেশে
চিন্‌বে কেন,—পুরাণোরে
নতুন যে বা চায়!
আয় ফিরে আয়,—
মনের পাখী,—
আয় ফিরে আয়,—
আপন কূলায়!

৫ জুন, ১৯৩৩





একটি চুমো

একটি চুমো,—নিরালাতে
সেই তো সুরা,—মন উদাসী
একটি চুমো,—জীবন ভরে'
পরিয়ে দিলে,—প্রেমের ফাঁসি।
একটি চুমো,—ভাবিয়ে তোলে
কতই কি যে,—এলোমেলো
একটি চুমো,—গণ্ডে প্রিয়ার
সেই তো আমার,—স্বর্গ হ'ল!
একটি চুমো,—আর কিছু নয়
তা'রই দোলায়,—জীবন দোলে
একটি চুমো,—জড়িয়ে বুকে
মর্‌তে পারি,—অবহেলে।
একটি চুমো,—মাতন তাহার
ফেনিয়ে তোলে,—রঙের নেশা
একটি চুমো,—কর্‌লে পাগল
চলা-পথের নেই কো দিশা।

একটি চুমো,—ঘুম-পাড়ানি
গাইলে সারা জীবন ভরে'
একটি চুমো,—নিঝুম্ করুক্
মরুর জীবন,—স্বপন ঘোরে।
একটি চুমো,—একটি চুমো
পুণ্য,—পাপে,—সব তেয়াগি
কাতর প্রাণে,—একটি চুমো
ভিক্ষা চাহি,—বাঁচার লাগি।

২ জুন, ১৯৪০





এপারে

এপারে শুধুই কোলাহলময়
জীবন পশরা বহি
পিয়িয়া মোহের মোহিনী-মদিরা
মায়াময় হ'য়ে রহি।
নয়নে যা' কিছু হেরি মনোহর
লভিতে করিনু আশা
শতেক জনের স্মিরিতি আগুলি'
কামনা বাঁধিছে বাসা।
স্পৃহনীয় যাহা,—লয়েছি সকলি
'আমার' বলিয়া টানি,
স্পৃহা তাহে শুধু বাড়িয়া চলেছে—
হয় নি তিলেক হানি।
আকুল তৃষায় সুধারাশি ভাবি
গরল পিয়িয়া মরি,
যাহারে আপন সুহৃদ জেনেছি—
দেখি সে ভীষণ অরি।

ঘুম-ঘোরে ঢাকা স্বপন জড়িত
আধ-খোলা আঁখি ল'য়ে
ঘুরে মরি শুধু অন্ধেরই প্রায়
মোহের জড়তা ব'য়ে।
মোহিনী মায়ার মোহন ছলনা
ভুলালো হৃদয়টারে,
পথ-ভোলা জনে কে ল'য়ে যাবি রে
ভব পারাবার পারে !

৪ ডিসেম্বর, ১৯২৭

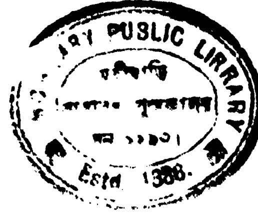


ওপারে

কোলাহলময় জীবনে আমার
পড়িল কাহার ছায়া
খেলাধূলা মোর চকিতে মিলালো—
লুকালো মোহন মায়া।
সুরের আবেশ,—কোন্ সুমধুর,—
মরমে পশিয়া মম
লুটায়ে পড়িল প্রণয় ছন্দে
নাশিয়া প্রাণের তমো।
জড়তা-জড়িত অসাড় হিয়ার
গোপন বারতা যত,
অশ্রুর রূপে নয়নে ঝরিছে
শ্রাবণ-ধারার মত।
ঝরে-পড়া মোর বাসনা-কুসুম
কেমনে নিমেষ মাঝে
রূপ-রস-বাসে অতুলন শোভা
হিয়া-সরোবরে রাজে।

অদেখা লোকের অজানা পথিক
আমার দুয়ারে আজি
মহা-মিলনের উজল-অর্ঘ্য
ভরিয়া আনিল সাজি।
গোপনে আমায় ডাক দিয়ে গেল,—
'হেথা নয়,—ওইখানে!'
সেই আশা মোরে,—জগতের পারে
লয়ে যেতে সদা টানে!

৬ ডিসেম্বর, ১৯২৭



গানের শেষে

গানের খাতা উঠ্‌ল ভরে'
গানে গানে
সুরখানি যে রইল তবু
মনের কোণে ;
সে সুর যে গো
গানের সাথে
ফুরায় না কো
শেষের পাতে
ভেসে চলে দিশাহারা
অচিন টানে ।

শুধালে পর
কয় সে হেসে
মিল্‌ব সেদিন
গানের শেষে
সুর রাণী
যে দিন এসে
দেবে দেখা
সঙ্গোপনে ।

কইতে চাওয়া
আমার বাণী
মুখর হ'য়ে
উঠবে ধ্বনি
সুর-রাণীর চরণ 'পরি—
অধর দুটী পরশনে !

৩০ জুন, ১৯৩৩

